بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমরা অতিথি মহোদয়ের সাথে আলোচনা, মতবিনিময়ের মাধ্যমে আকাইদের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সুন্দর ও স্পষ্ট একটি ধারণা অর্জন করতে পেরেছো। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের খাতায় লিখে রেখেছো। চলো, এখন শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একক/জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখ।

দলগত কাজ

তোমরা আজকের আলোচনা থেকে আকাইদ সম্পর্কে কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, দলে আলোচনা করে লিখ।

আল্লাহর পরিচয়

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি কি মনে করো একটি পিঁপড়ার পক্ষে এ পৃথিবীর বাস্তব রূপ ও এর বিশালতা দেখা সম্ভব? হয়তো তুমি বলবে, 'নিশ্চয়ই না'। একটি সামান্য পিঁপড়ার পক্ষে এটি যেমন অসম্ভব, তেমনি এ বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃত পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক জানা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি তাঁর সৃষ্টিরাজির কোনো কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর এ সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচয়, নিদর্শন ও মহিমা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন আমাদের বসবাসের এই জমিন, মাথার উপরের আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, আকাশে চলমান মেঘমালা, বায়ুপ্রবাহ, রাত এবং দিনের পরিবর্তন; এসব নিয়ে আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে এসবের মাঝে আমরা মহান আল্লাহর অজস্র মহিমা ও নিদর্শন খুঁজে পাই। আবার পবিত্র

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত 'আল-আসমাউল হুসনা'র মাঝেও মহান আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে। তোমার অবশ্যই মনে আছে, মহান আল্লাহর ওপর ইমান প্রসঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তুমি আল্লাহর গুণের পরিচয় জানতে আল আসমাউল হুসনা থেকে কয়েকটির বিবরণ জেনেছো। এ শ্রেণিতে আমরা আরো কয়েকটি আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কে আলোচনা করবো। তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক।

আল্লাহ তাওয়াবুন (اَللّٰهُ تَوَّابٌ)

তাওয়াবুন (تَوَّابٌ) অর্থ তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ নিজেই তাঁর নাম রেখেছেন 'আত-তাওয়াব' (اَلتَّوَّابُ)। তাওয়াব হলো যিনি সর্বদা তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। অতএব যারা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করে, তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহই তাঁর বান্দাকে তাওবা করার তৌফিক দান করেন। ফলে বান্দা গুনাহের কাজ থেকে ফিরে আসে। সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে এবং উক্ত গুনাহের কাজে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। আর এভাবে বান্দা যখন খাঁটি তাওবা করে তখন আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১০৪)

মহান আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২২২)

প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যেন দিনের পাপী ব্যক্তিরা রাতে তাওবা করে নিতে পারে। আবার তিনি দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপী ব্যক্তিরা দিনে তাওবা করে নিতে পারে। যখন কেউ অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মন্দ কাজকে ভালো দিয়ে পরিবর্তন করে দেন।

জোড়ায় কাজ

'আল্লাহ তাওয়াবুন' মহান আল্লাহর এই নামের শিক্ষা তোমার/তোমাদের কর্মে বাস্তবায়নে কী কী করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

আল্লাহ কাদিরুন (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

কাদিরুন (قَدِيْرٌ) অর্থ সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল-কাদির হলেন এমন সত্তা, যিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর এগুলো তিনি সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় তিনি সকলকে জীবিত করবেন আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে শাস্তি দিবেন। তিনি এমন এক সত্তা যিনি কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করলে শুধু কুন (كُنْ) বা 'হও' বলেন, সাথে সাথে তা হয়ে যায়। তিনিই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। আর তিনি যাকে যেভাবে চান সেভাবেই পরিবর্তন করেন। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। সবকিছুর ওপর তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০)

আল্লাহ ওয়াদুদুন (اَللّٰهُ وَدُوْدٌ)

ওয়াদুদ শব্দের অর্থ পরম স্নেহপরায়ণ, প্রেমময়, প্রেমাস্পদ। 'আল্লাহ ওয়াদুদুন' অর্থ আল্লাহ পরম প্রেমময় ও স্নেহপরায়ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝

অর্থ: 'এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়।' (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ১৪)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি ভালোবেসেই তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই বান্দার দায়িত্ব হলো তাঁর বন্দেগি করা এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা।

সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এজন্য মহানবির একটি উপাধি 'হাবিব'। মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁর প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)-কে ভালোবাসা। তাঁর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' (সূরা আলে- ইমরান, আয়াত: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এতই ভালোবাসেন যে, তারা পাহাড়সম গুনাহ করার পর তাওবা করলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তাওবাকারীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা কখনই বন্ধ করেন না। কারণ তাঁর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদুদ নাম থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

আমাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। আমরা যতই অন্যায় ও অপরাধ করি না কেন, আল্লাহর কাছে ফিরে আসলে তিনি আনন্দিত হন, আমাদের ক্ষমা করে দেন। তিনি আমাদের কল্যাণ চান। আমাদেরকে জান্নাত দান করতে চান। তাই আমরা আল্লাহর ইবাদাত করবো। তাঁর যাবতীয় আদেশের অনুসরণ করবো। তাঁর হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে ভালোবাসবো। আল্লাহর জন্যই সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ভালোবাসবো।

আল্লাহ জাব্বারুন (اَللّٰهُ جَبَّارٌ)

জাব্বার শব্দের অর্থ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী ইত্যাদি। আল্লাহু জাব্বারুন অর্থ আল্লাহ পরাক্রমশালী। মহান আল্লাহর সামনে সবাই পরাভূত ও দুর্বল। তিনিই সবচেয়ে মহিমান্বিত। অহংকার করার একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। একই সাথে বান্দাদের প্রতি তিনি পরম স্নেহশীল ও দয়ালু। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ গুণবাচক নামটি একবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর আদেশ ও ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কেউ তাঁকে পরাভূত করতে পারে না। বরং তিনিই সবার উপর ক্ষমতাবান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহর এ গুণবাচক নামটি আমাদেরকে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখতে শেখায়। আমরা বুঝতে পারি, যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তাই তাঁর ইচ্ছায় নিজেদের সমর্পিত করার মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে।

এটি আমাদের আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী হতে শেখায়। আল্লাহু জাব্বারুন নামের বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহকেই সবচেয়ে বড় মনে করে।

আমরা মহান আল্লাহর এ গুণটি উপলব্ধি করবো। তাঁকে সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হিসেবে জানবো। সকল কাজে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবো। অন্যায় ও খারাপ কাজ পরিহার করবো।

আল্লাহ সামাদুন (اَللّٰهُ صَمَدٌ)

সামাদ অর্থ অমুখাপেক্ষী, চিরন্তন, অবিনশ্বর ইত্যাদি। আল্লাহ সামাদুন অর্থ হলো আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার কারও প্রয়োজন নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

অর্থ: আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ২)

পৃথিবীর সবকিছু অস্তিত্বহীন ছিলো। মহান আল্লাহই সবকিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারে না। সকল সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, পানাহার, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত। কেউ তাঁর হুকুমের বাইরে যেতে পারে না। তিনি তাঁর গুণাবলি ও কর্মে পরিপূর্ণ, নিখুঁত। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর শুধু তিনি থাকবেন। আসমান-জমিনের সবকিছু তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করে। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেই সবাই টিকে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তার নিকট প্রার্থী।' (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৯)

মহান আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছু মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। মহান আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এমনকি মানুষের ইবাদাত-বন্দেগি, তাসবিহ-তাহলিলেরও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজেদের কল্যাণ ও প্রয়োজনেই তাঁর ইবাদাত-বন্দেগি করা উচিত। মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হলে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। এমনকি অনুগত বান্দা হলেও তাঁর বিশেষ কোনো লাভ নেই। তাঁর আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এক কথায় তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী ও দোষমুক্ত একমাত্র সত্তা।

আমরা মহান আল্লাহর এই গুণটি সুন্দরভাবে অনুধাবন করবো। একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হবো। তাঁর উপর ভরসা করতে শিখবো।

জোড়ায় কাজ

মহান আল্লাহর পরিচয় তথা আসমাউল হুসনা জানার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার নতুন যে যে বিশ্বাস তৈরি হলো:

১. আমরা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

২. .....

৩. .....

৪. .....

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রতিফলন ডায়েরিতে নিম্নোক্ত শিরোনামে বাড়িতে লিখবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের যেমন: মাতা-পিতা/দাদা-দাদি/বড় ভাই-বোন/ সহপাঠী প্রমুখের সহায়তা নিতে পারো।)

মহান আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত বিশ্বাসের ফলে আমার চরিত্রে যেসব গুণের প্রতিফলন ও চর্চা অব্যাহত রাখব।

১. আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ চাইলে, তিনি আমাদের মাফ করে দেন। আমরাও যথাসম্ভব অন্যকে মাফ করে দিবো।

২. .....

৩. .....

৪. .....

রাসুলগণের প্রতি ইমান

মানব জাতিকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। রাসুলগণ আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। তাঁদের প্রচারিত বাণী আল্লাহরই বাণী। এই বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো রাসুলগণের প্রতি ইমান। রাসুলগণের প্রতি ইমান বলতে নবি-রাসুল উভয়কে বুঝানো হয়েছে। রাসুল শব্দটি রিসালাত শব্দ থেকে এসেছে। রিসালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ চিঠি, বার্তা, সংবাদ ইত্যাদি। সুতরাং রিসালাত বলতে আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। এ দায়িত্ব পালনকারীকে রাসুল বলা হয়। রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তাঁদের সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫)

রাসুলগণের প্রতি ইমান আনার অপরিহার্যতা

ইমানের পূর্ণতার জন্য ইসলামের ৭টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি ইমান না আনলে তাওহিদে বিশ্বাস পূর্ণ হবে না। নবি-রাসুলগণের কাউকে বিশ্বাস করা আর কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবি-রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। সবাইকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে। তাঁদের সবার

প্রতি ইমান আনতে হবে। তাঁদের প্রতি ইমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ○

অর্থ: 'তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫)

নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি করা, মানুষকে সরল সঠিক পথ দেখানো, পরকাল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা, আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ভ্রান্ত পথ ও মত দূর করে সত্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

নবি-রাসুলগণের গুণাবলি

নবি-রাসুলগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত। তিনি তাঁদের সব ধরনের চারিত্রিক ও মানবিক দোষত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মাসুম বা নিষ্পাপ। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তাঁরা ছিলেন আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪৭) দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের প্রতি নবি-রাসুলগণের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁরা ছিলেন মিষ্টভাষী, ভদ্র, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, প্রতিকূল পরিবেশে তাওহিদের দাওয়াত প্রদানকারী এবং সৎকর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুলগণের গুণাবলি উল্লেখ করে বলেন, 'এবং স্মরণ করুন ইসমা'ইল, ইদরিস ও যুল-কিফল-এর কথা, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল; এবং তাঁদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ'। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৫-৮৬)

নবি-রাসুলগণের অনুসরণ

মানব জাতিকে হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ ওহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। নবি-রাসুলগণ মানবজাতিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সে অনুযায়ী আমল করবে তারা মৃত্যুর পর মহা সুখের জান্নাত লাভ করবে। আর যারা নবি-রাসুলের অনুসরণ না করে পাপ কাজে লিপ্ত হবে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই নবি-রাসুলের অনুসরণ করা সবার ইমানি দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا○

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭১)

আমরা সবাই আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করবো।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও নবিগণের মর্যাদা

আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসুলগণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবি-রাসুলদের একেক জনকে মহান আল্লাহ বিশেষ বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা 'খলিল' বা বন্ধু বলে আখ্যায়িত করছেন। হযরত সুলাইমান (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)-কে নবুওয়াত ও বাদশাহী দান করেছিলেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-কে ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-কে তুর পাহাড়ে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল 'রুহুল্লাহ'। তিনি দোলনায় থাকাকালেই কথা বলেছেন। এ ছাড়া মহান আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন। এভাবেই সব নবি-রাসুলকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আলাদা মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

অর্থ: 'এ রাসুলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৩)

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সবার উপরে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল ছিলেন। তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কেবল এ পৃথিবী আর মানুষই নয়; বরং জগৎসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সবার ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ رَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ۝

অর্থ: 'এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।' (সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: ৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝

অর্থ: 'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের নেতা হবো। আর এ কথা গর্ব করে বলছি না'। তিনি আরো বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবো। আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে'। (তিরমিযি)

নবি-রাসুলগণের মু'জিযা

সকল যুগে রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও হেদায়েতের পথ সুগম করে ইমানি সফলতার জন্য মু'জিযার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুলগণকে তাঁদের নবুওয়াতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে অলৌকিক প্রমাণ বা মু'জিযা দান করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মু'জিযা ছিল তৎকালীন সময়ের জন্য। তাঁদের তিরোধানের সাথে সাথে তাঁদের মু'জিযা দেখার কোনো উপায় ছিল না। যেমন- হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি সাপে পরিণত হতো, হযরত ঈসা (আ.) 'কুম বিইযনিল্লাহ' (আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও) বললে মৃত ব্যক্তি জীবিত হতো; মাটির টুকরায় ফুঁ দিলে পাখি হয়ে উড়ে যেত; অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি লাভ করতো; কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতো। এ সবই তাঁদের মু'জিযা বা অনন্য নিদর্শন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনে অসংখ্য মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন তাঁর পবিত্র হাতের ইশারায় চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, মিরাজের রাতে উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করা এবং আল্লাহর দিদার লাভ করা, গাছ-পাথর কর্তৃক তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল-কুরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত ও বিদ্যমান থাকবে।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

নবি শব্দের অর্থ সংবাদবাহক। আর রাসুল শব্দের অর্থ দূত। নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে নতুন শরিয়ত দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান, তাঁকে রাসুল বলা হয় । আর যাকে নতুন শরিয়ত না দিয়ে পূর্বের রাসুলের শরিয়তই প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তাঁকে নবি বলা হয়। প্রত্যেক রাসুলই

নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবিই রাসুল নন। নবুওয়াতের ধারায় প্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.) আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

নবি-রাসুলের সংখ্যা

নবি-রাসুলগণের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নবিদের সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার। তার মধ্যে ৩১৩ বা অন্য বর্ণনায় ৩১৫ জন রাসুল'। (তাবারানি)

আল-কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম এসেছে । তবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট নবি পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ○

অর্থ: 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।' (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ২৪)

তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যকের নাম কুরআন ও হাদিসে এসেছে। আর অধিকাংশের নাম আসেনি। এ বিষয়ে কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আমি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাঁদের কারও কারও কথা আপনার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা আপনার নিকট বিবৃত করিনি।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৭৮)

নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অংশ। দুনিয়াতে যারা নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করবে, ইহকাল ও পরকালে তারা সফলকাম হবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

যেসব বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে রাসুলগণের প্রতি আমার ইমান দৃঢ় করবো

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে পূরণ করো।)

ক্রমিক	বিশ্বাসসমূহ	কাজসমূহ
১.	সকল নবি-রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।	নবি-রাসুলগণ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের অনুসরণ করে আমিও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবো।

খতমে নবুওয়াত

খাতামুন অর্থ শেষ বা সমাপ্ত। আর নবুওয়াত অর্থ পয়গম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুওয়াতের অর্থ নবুওয়াতের সমাপ্তি। খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুওয়াতের সিলমোহর হলো নবুওয়াতের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। নবুওয়াত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারার সমাপ্তিকেই খতমে নবুওয়াত বলা হয়। আর যার মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবি ও রাসুল

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। দুনিয়াতে আগমনকারী সব নবি-রাসুলই কোনো বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সারা বিশ্বের সকল মানুষের নবি। নবি আগমনের ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না।

খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারবে না। তাঁর পরবর্তী সময়ে যারা নবুওয়াত দাবি করেছে তারা সবাই ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কুরআন মাজিদ ও হাদিসে খতমে নবুওয়াতের অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। এর মধ্যে কতিপয় প্রমাণ নিম্নরূপ:

আল-কুরআনের দলিল

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মহানবি (সা.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবি।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

হাদিসের দলিল

খতমে নবুওয়াত প্রমাণে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন—

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অর্থ: 'আমিই শেষ নবি। আমার পরে আর কোনো নবি নেই।' (তিরমিযি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসুল আসবে না'। (তিরমিযি)

নবি কারিম (সা.) আরো বলেন, 'বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইন্তেকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।' (বুখারি)

অন্য এক হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবি হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না'। (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো এমন যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল- 'এ কোণে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমিই সে ইট এবং আমিই শেষ নবি।' (বুখারি)

উপমার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, মহানবি (সা.) হলেন নবুওয়াতের দালানের সর্বশেষ ইট। তাঁর মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানে আর ইট লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল।

যৌক্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকল কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে। তাই নবুওয়াতেরও শুরু এবং শেষ আছে। এক নবির পর অন্য নবি আসার কতগুলো যৌক্তিক কারণ থাকে। যেমন–

১. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা যদি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

২. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষায় যদি নতুন কিছু সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন হয়।

৩. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা যদি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে যায়।

মহানবি (সা.)- এর নবুওয়াতের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই প্রযোজ্য নয়। কেননা, মহানবি (সা.) কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সময়ের জন্য আসেননি। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের নবি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا

অর্থ: আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে দ্বীন (ইসলাম) পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এতে কোনোরূপ সংযোজন-বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

অর্থ: 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং রাসুল। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না এবং আসার কোনো প্রয়োজনও নেই। তারপরে যদি কেউ নবুওয়াতের দাবি করে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ও প্রতারক।

আমরা খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করবো। এতে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য অংশ। আমরা আমাদের জীবনের সর্বাবস্থায় মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলবো।

জোড়ায়/দলগত কাজ ও উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আল-কুরআন ও হাদিসের বাণীসমূহ ছোট কাগজে অর্থসহ লিখ।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবি।

ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন

হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে পুনরাগমন ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমনে বিশ্বাস ইসলামি আকিদার একটি দিক। কিয়ামতের ১০টি বড় আলামতের অন্যতম হলো ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন।

আখেরি যামানায় ইমাম মাহদি (আ.)- এর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত। ইমাম মাহদি (আ.) এবং ঈসা (আ.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনীত দ্বীন ইসলামের অনুসারী হবেন।

ইমাম মাহদির পরিচয়

ইমাম মাহদির প্রকৃত নাম হবে মুহাম্মাদ এবং পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর হবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মাহদি আসবেন আমার বংশধর হতে। তাঁর কপাল হবে উজ্জ্বল এবং নাক হবে উন্নত। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন, যেভাবে পৃথিবী যুলুম-নির্যাতনে পূর্ণ হয়েছিল।' (আবু দাউদ)

ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী যখন যুলুম-নির্যাতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্নীতি, হিংসা ও হানাহানিতে ভরে যাবে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে চলে যাবে, তখন শুধু মুসলমানরাই নয়, বিশ্বের সকল নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত জাতি একজন ত্রাণকর্তার আগমন কামনা করবেন। যিনি তাদেরকে অন্যায়-অবিচারের অন্ধকার থেকে মহামুক্তির আলোর দিকে পথ দেখাবেন। তখন উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে একজন ব্যক্তি আগমন করবেন। তিনি রমযান মাসে কাবা ঘর তাওয়াফ অবস্থায় প্রকাশ পাবেন। কাবা চত্বরে মুসলমানগণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বছর রমযান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ এবং রমযান মাসের শেষের দিকে চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটবে, সেই বছরই ইমাম মাহদি'র আবির্ভাব হবে'। তিনি শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর উম্মাত হিসেবে এ দুনিয়াতে আসবেন। তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। ইসলাম ধর্মকে সংস্কার করবেন। ইসলামি শরিয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। পৃথিবী হতে যুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

ঈসা (আ.)- এর আগমন

ইমাম মাহদি (আ.)- এর আবির্ভাবের সাত বছরের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। দাজ্জাল ও তার বাহিনী মুসলমানদের উপরে অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন করতে থাকবে। একদিন দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ঈসা (আ.) দামেস্কের একটি মসজিদে অবতরণ করবেন। তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদি হিসেবে দুনিয়াতে আসবেন। নেমে এসে তিনি ইমাম মাহদি (আ.)- এর সাথে মুসাফাহা করবেন। এরপর ইমাম মাহদির পিছনে মুক্তাদি হয়ে আসরের সালাত আদায় করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সেদিন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ.) অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন তোমাদের ইমাম হবেন।' (বুখারি)

আখিরাতের প্রতি ইমান

প্রিয় শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণিতে তুমি আখিরাত জীবনের বিভিন্ন স্তর এবং ইমানের সাতটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জেনেছো। সপ্তম শ্রেণিতে ইমানের সাতটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ইমান, ফিরিশতাগণের প্রতি ইমান, কিতাবসমূহের প্রতি ইমান-সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছো। এরই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে তুমি আখিরাত জীবনের অংশ হিসেবে কিয়ামত, পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে তাকদিরের ওপর ইমান, শাফা'আত এবং শিরক সম্পর্কে জানতে পারবে।

জোড়ায় কাজ

কিয়ামত দিবসের তাৎপর্য এবং আমার বিশ্বাস
উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল/জোড়ায় আলোচনা করো।

কিয়ামত

ইসলামি আকিদা মোতাবেক কিয়ামত বলতে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান অতঃপর হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝায়। নিম্নে এ বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো:

(ক) মহাপ্রলয়

কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে মহান আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন। তিনি ছাড়া কেউ তা জানেন না। যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় চলে আসবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘটবে। এ মহাপ্রলয়ের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ ভয়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো ছুটাছুটি করতে থাকবে। তারা তাদের পরিবারের লোকদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ফিরে যাবার অবকাশ পাবে না। বন্য পশুরা ভয়ে একত্রিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১-২)

সেদিন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে। আসমান ও জমিনে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। পর্বতমালা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং রঙিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। সমুদ্রে আগুন জ্বলে ওঠবে। আকাশের আবরণ অপসারিত হয়ে গলিত তামার ন্যায়

হবে। সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। নক্ষত্ররাজি বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে যাবে। সেদিন আকাশসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে নেওয়া হবে যেভাবে পুস্তকে লিখিত কাগজপত্র গুটিয়ে রাখা হয়। এভাবে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের প্রথম পর্ব সংঘটিত হবে। এ মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ।

(খ) পুনরুত্থান

পুনরুত্থান অর্থ পুনরায় উত্থান, কবর হতে মৃতের উত্থান। মহান আল্লাহ মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ তথা পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২৬)

শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনরুত্থান ও হাশর বা মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিনই বিচারের দিন। আখিরাত বা পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা এদিন থেকেই হবে। আল-কুরআনে এ দিনকে 'ইয়াওমুল বা'ছ' বা পুনরুত্থান দিবস, হিসাব গ্রহণের দিবস, প্রতিদান দিবস ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যারা এই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও বিশ্বাস রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭)

বাড়ির কাজ

'কিয়ামত সম্পর্কে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ধারণা'

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি তোমার প্রতিফলন ডায়েরিতে উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে ছকটি পূরণ করবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহাপাঠীর ধারণা জানতে পারো।)

ক্রমিক	পরিবারের সদস্য	বিশ্বাস	সঠিক/ভুল
১.	বড় ভাই	ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত শুরু হবে।	সঠিক
২.			
৩.			
৪.			

(গ) হাশর

হাশর অর্থ একত্রিত হওয়া। মহান আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাধ্যমে সবাই পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ দিন সবাই নিজ নিজ কর্মফলপ্রাপ্ত হবে। তাই এটি 'ইয়াউমুদ্দিন' বা কর্মফল দিবস।

পৃথিবীই হবে হাশরের মাঠ। কিয়ামতের দিন পৃথিবী পরিণত হবে একটা উদ্ভিদশূন্য মসৃণ সমতল প্রান্তরে। মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে। হাশরের দিনের দৈর্ঘ্য হবে আমাদের গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আর এ দিনটিই হবে কবর থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দিন। প্রত্যেক মানুষ ভীত-শঙ্কিত চোখে তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে জাগিয়ে তুলল। তারা আহবানকারীর দিকে দৌঁড়াতে থাকবে। তাদেরকে মনে হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। কাফিররা বলবে, এটা তো কঠিন দিন। সহসাই সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হয়ে যাবে। মানুষ মনে করবে তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।

সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্যের দিকে তাকানোর মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। সেদিন পিতা তার সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবে না। সন্তানও পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, তিনি ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে পালিয়ে থাকবে।

মহান আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করবেন। জিবরাইল (আ.) সহ ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকবেন। পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এক ক্ষীণ অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যাবে না। সকলেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনত হবে। জমিন তার রবের জ্যোতিতে ঝলমল করে উঠবে। নবিগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। আমলনামা পেশ করা হবে। অপরাধীরা তাদের আমলনামা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ যায়নি। এতে তো সব কিছুই রয়েছে।' প্রত্যেক মানুষ তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। জান্নাতকে নিকটে আনা হবে। জাহান্নামকে উন্মুক্ত করা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এ উপলব্ধি তার কোনো কাজে আসবে না। সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু আগে পাঠাতাম! অর্থাৎ দুনিয়াতে নেক আমল করতাম। হায় আফসোস! আমাকে যদি আর একবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।' সেদিন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা ভালো কাজ করব, আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী।

সেদিন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে নূর ছুটতে থাকবে। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছুটা নিতে পারি। বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো।' অতঃপর উভয়ের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতর ভাগে থাকবে রহমত আর বাহিরে সর্বত্র থাকবে আযাব।

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তার আমলনামা ডানহাতে পাবে সে বলবে, 'এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতপর তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে। সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে।

মুত্তাকিদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখি হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।'

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি ধূসরিত ও বিবর্ণ হবে। পাপের কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির ও পাপাচারী। তারা তাদের আমলনামা বাম হাতে পাবে। আর যার আমালনামা বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, 'হায় আফসোস! আমাকে যদি আমার আমালনামা না দেওয়া হতো। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ, আমার ক্ষমতা কোনো কাজেই এলো না।' আর যাকে তার আমালনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে। সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে। আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। অপরাধীরা সেদিন নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যাবে। তাদের মাথার চুল ও পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হবে।

কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে-এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানে থাকতে হবে। কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।

দলগত আলোচনা

পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি এবং আযাব থেকে দূরে থাকার জন্য করণীয়

উল্লিখিত শিরোনামে বাস্তব জীবনে তুমি/তোমরা কী কী কাজ করবে এবং কী কী কাজ থেকে দূরে থাকবে, দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করো।

যে যে কাজ করবো	যে যে কাজ করবো না
মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করবো।	আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করবো না।

তাকদিরের প্রতি ইমান

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা হয়তো তাকদির সম্পর্কে পূর্বে থেকেই জানো। তাকদির সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ের মূল আলোচনা শুরুর আগে চলো আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় আলোচনায় অংশ নেই।

জোড়ায় আলোচনা

তাকদিরে বিশ্বাসের ফলে তোমাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন হতে পারে বলে তোমরা মনে করো।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

১. মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বেড়ে যাবে।

২. .....

৩. .....

৪. .....

তাকদির আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারণ করা, নির্দিষ্ট করা, ধার্য করা, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে তাকদিরসহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর কোথায়, কোন সময় কী ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তা পূর্ব নির্ধারিত। পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর যত বিপদ আসে তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে (তাকদিরে) লিপিবদ্ধ আছে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। অতএব কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আফসোস করা যাবে না। আবার ভালো কিছু পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কারণ ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। তাকদিরের বাইরে কোনো কিছুই নেই। সবকিছুই তাকদির অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও।

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে অবশ্যই তাকদির বিশ্বাস করতে হবে। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাকদিরের প্রকারভেদ

তাকদির দুই প্রকার। যথা:

১. তাকদিরে মুবরাম অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় তাকদির ও

২. তাকদিরে মুআল্লাক অর্থাৎ পরিবর্তনযোগ্য তাকদির।

তাকদিরে মুবরাম কখনোই পরিবর্তিত হয় না। আর তাকদিরে মুআল্লাক বান্দার নেক আমল, দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দোয়া ভাগ্যকে পরিবর্তন করাতে পারে। আর নেক আমল বয়সকে বৃদ্ধি করাতে পারে।' (তিরমিযি)

তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভালো-মন্দ ইত্যাদি কাজ করছে বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা আলিমুল গায়েব। আমরা কখন কী করব, কী খাব, কোথায় কী ঘটবে-এগুলো আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। ফলে তিনি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অনেকে প্রশ্ন করেন মানুষ ভালো-মন্দ যত কাজ করে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে করে। তাহলে মানুষের কী দোষ? কেন আল্লাহ মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন? আসলে মহান আল্লাহ মানুষকে ভালো এবং মন্দ দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

অর্থ: 'আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেওয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।' (সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২২)

আল্লাহ মানুষকে কর্মনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই পেতে পারে না। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন আর ভালো ও মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দান করেছেন। ভালো এবং মন্দ কাজ মানুষ স্ব-জ্ঞানে ও নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় কাউকে ভালো বা মন্দ কাজ করার জন্য বাধ্য করেন না। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ ইমানদার হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ: আর আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনতো। তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?' (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো উত্তম পথে চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্ট করে তার জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। অতএব নিজেদের খারাপ কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লেখার কারণে হয়েছে এ ধরনের কথা বলে খারাপ কর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাকদিরের দোহাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি বা জান্নাত লাভ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়। উমর (রা.)- এর খেলাফত আমলে এক লোক চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হলো এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলো। শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হলো। লোকটি উমর (রা.)- এর কাছে গিয়ে বলল, 'মুসলিম জাহানের হে মহান খলিফা! আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। আমিও তো আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নই। আমি তাঁর ইচ্ছায়ই চুরি করেছি। আমার হাত কাটা যাবে কেন?' উমর (রা.) বললেন, 'সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় বা তাকদিরের কারণে হয়। তুমি যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় চুরি করেছ, তেমনি তোমার হাত আল্লাহর ইচ্ছায়ই কাটা হবে।'

শাফা'আত (اَلشَّفَاعَةُ)

শাফা'আত আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ কোনো কিছু জোড় সংখ্যক হওয়া, কারও জন্য সুপারিশ করা, অনুরোধ করা, মধ্যস্থতা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় শেষ বিচারের দিন ক্ষমা ও কল্যাণ লাভের জন্য মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবি-রাসুলগণ, ফেরেশতাগণ ও পুণ্যবান বান্দাগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করাকে শাফা'আত বলে।

জোড়ায় আলোচনা

পরকালে শাফা'আত লাভের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে আমি যেসব ভাল কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

ক্ষেত্রসমূহ	যেসব ভালো কাজ করবো	যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো
ব্যক্তিগত জীবনে	কুরআন তিলাওয়াত	রোযা ভঙ্গ করবো না
পরিবারে		
বিদ্যালয়ে		
সমাজে		

শাফা'আতের তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকলের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন। তখন আমল অনুযায়ী পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত আর পাপীদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবি-রাসুলগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহর কাছে পাপীদের পাপ মার্জনার জন্য শাফা'আত করবেন। তখন পাপীরা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য লাভ করবে। আর পুণ্যবানদের জন্য শাফা'আত করার কারণে জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

হাশরের ময়দানের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে । সকল মানুষ খুবই পিপাসার্ত হবে এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে। তারা নিজেদের পরিণতি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকবে। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ নবি-রাসুলগণ ও পুণ্যবান বান্দাগণকে শাফা'আত করার বিশেষ অনুমতি দিবেন।

কুরআন ও হাদিসে শাফা'আত

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। পবিত্র কুরআনে শাফা'আত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

অর্থ: 'যে পরম দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৭)

তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন,

وَ لَا تَنۡفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا لِمَنۡ اَذِنَ لَهٗ ؕ

অর্থ: 'যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা, আয়াত: ২৩)

এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে কাফির-মুশরিকদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো শাফা'আত থাকবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কিয়ামতের ময়দানে অসহায় হয়ে পড়বে।

মহানবি (সা.)- এর হাদিসেও শাফা'আতের কথা এসেছে। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীতে যত ইট পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি মানুষের জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবো।' (মুসনাদে আহমদ)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন,

أُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ: 'আমাকে শাফা'আত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।' (বুখারি ও মুসলিম)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাণীর আলোকে এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, কিয়ামতের দিন চরম ভয়াবহ মুহূর্তে নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিজে কুরআন ও পুণ্যবান বান্দাগণ মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করার অনুমতি লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলা এসব শাফা'আত কবুল করবেন এবং অসংখ্য মানুষকে জান্নাত দিবেন। তবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সবচেয়ে বৃহৎ পরিসরে শাফা'আত করার অধিকার দেওয়া হবে।

শাফা'আত-এর বিভিন্ন পর্যায়

শাফা'আত সম্পর্কিত হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা শাফা'আত-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কথা জানতে পারি। যথা-

ক. কিয়ামতের দিন সবাই যখন হিসাবের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হবেন, তখন এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। সূর্য থাকবে খুবই নিকটে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মানুষের কষ্টের সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় মানুষ পর্যায়ক্রমে আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে এসে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করতে অনুরোধ করবে। কিন্তু তাঁরা সবাই অপারগতা প্রকাশ করবেন। সবশেষে তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর কাছে আসবে। তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য শাফা'আত করবেন। একে বলা হয় শাফা'আতে কুবরা।

খ. হিসাব-নিকাশের পর যেসব মুমিন জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে, তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের জন্য মহানবি (সা.) মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। তাঁর জন্যই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে।

গ. বিনা হিসাবে জান্নাত দানের শাফা'আত। এ শাফা'আতে উম্মতে মুহাম্মাদির বিপুল সংখ্যক লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ শাফা'আতও কেবল মহানবি (সা.)- এর জন্য নির্দিষ্ট।

ঘ. যেসব মুমিন পাপের জন্য জাহান্নামের উপযুক্ত হবে, তাদের ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য মহানবি (সা.) শাফা'আত করবেন।

ঙ. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তিদানের জন্য মহানবি (সা.) শাফা'আত করবেন।

চ. যেসব মুমিন জান্নাতবাসী হয়েছেন, জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফা'আত। এ শাফা'আত অন্যান্য নবি-রাসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামও করবেন।

ছ. একদল মানুষ পাপ-পুণ্য সমান হওয়ায় আ'রাফে অবস্থান করবে। আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থান। মহানবি (সা.) তাঁদের জন্যও শাফা'আত করবেন। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

জ. কিয়ামতের দিন আল-কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য এবং সাওম পালনকারীদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

শাফা'আত মহান আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ নিয়ামত। আমরা প্রিয় নবি (সা.)-এর শাফা'আতে বিশ্বাস করবো। তাঁকে ভালোবাসবো এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়বো। তাহলে আমরা পরকালে মহানবি (সা.)- এর শাফা'আত লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। কারণ তাঁর শাফা'আত ছাড়া আমাদের পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবে না।

শিরক (اَلشِّرْكُ)

শিরকের পরিচয়

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সহযোগী বানানো, সমকক্ষ বা সমতুল্য করা। ইসলামি পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ বা সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলে। আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকতো, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত'। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২) পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۚ

অর্থ: 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১)

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক ৩ প্রকার–

১. **আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা**

যেমন, আল্লাহ তা'আলার পিতা, স্ত্রী এবং সন্তান আছে এই বিশ্বাস করা। এ ধরনের শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৩-৪)

২. **ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করা**

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন, সালাত, সাওম, পশু কুরবানি ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা উদ্দেশ্যে করা । এ ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

অর্থ: 'বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২)

৩. **আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিতে শিরক**

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিতে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা । আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক মনে করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে?' (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ৩)

একক কাজ

শিরক হয়/হতে পারে এমন কাজগুলোর তালিকা তৈরি করো।

১। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদাতের মালিক মনে করা।

২। .....

৩। .....

৪। .....

শিরকের পরিণাম ও প্রতিকার

আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক। এর পরিণাম ভয়াবহ। পৃথিবীতে যত প্রকার যুলুম আছে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ বা যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।' (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩)

সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাই মানুষ কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই মহান আল্লাহর জন্য সকল ইবাদাত ও আমল হবে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত। শিরক মিশ্রিত যে কোনো আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা যুমার, আয়াত: ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তাঁর দয়া, রহমত ও ক্ষমা ব্যতীত দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি সম্ভব নয়। পরকালে মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৭২)

এ প্রসঙ্গে নবি করিম (সা.) বলেন, 'জিবরাইল (আ.) আমার নিকট এসে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ শিরক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (মুসলিম)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বারবার শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরক হলো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাই সকলের কর্তব্য হলো সর্বদা শিরক থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকা। কোনোভাবে শিরক হয়ে গেলে পুনরায় বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে ইমানের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপ না করার অঙ্গীকার করা।

আমরা শিরক থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকবো এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবো।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

দৈনন্দিন জীবনে শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য আমি যেসব ভালো কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ বর্জন করবো।

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শ্রেণিতে পূরণ করবে।)

ক্রমিক	করণীয়	বর্জনীয়
১		
২		
৩		
৪		
৫		

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে তোমরা ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। তুমি এখন সহজেই অনুমান করতে পারবে তোমার চারপাশের সমাজে এমন কিছু বিশ্বাস ও কাজ হচ্ছে যা ইসলামসম্মত নয়। একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে তোমাকে এ ধরনের বিশ্বাস ও কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত থাকতে হবে। চলো, মুসলিম সমাজে ইসলামি আকিদা পরিপন্থী প্রচলিত বিশ্বাস ও কাজগুলো চিহ্নিত করি। এই কাজে শিক্ষক ও অন্য বন্ধুদের সহায়তা নাও। প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য বা ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন গুরুজনদের মতামত নাও।